Vol. 34 | No. 3 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান প্রজামণ্ডল

Volume	34
Issue	3
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া
Published online	June 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i3.2
Pages	19-40
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান প্রজামণ্ডল

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া

১৮৯১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করে উত্তরবঙ্গে যাত্রা করেন।[১] গত দু'বছর ধরে জমিদারি পরিদর্শনের জন্য তাঁকে নানাস্থানে যেতে হয়েছিল, তখন জমিদারি পরিচালনার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়নি। নানা কারণে মহর্ষির অন্য সন্তানদের দ্বারা জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব ছিলনা বলেই রবীন্দ্রনাথের ওপর তা অর্পিত হয়। [২]

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন যে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে জীবনের কোন কঠিন দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়নি। সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্যের মধ্যেই দিন কাটছিল; হঠাৎ বিরাট এজমালি ঠাকুর এস্টেটের পরিচালনার ভার তাঁর উপরে এসে পড়ল। অবশ্য, এ-কাজে তিনি একেবারে কাঁচা ছিলেন না। পিতার ইচ্ছায় বাইশ বছর বয়স থেকে তাঁকে কলকাতার সেরেস্তায় কাজ শিখতে হয়েছিল। তিনি নায়েব থেকে কেরানীর কাজ পর্যন্ত রপ্ত করেছিলেন। এবারে কবি এবং মানুষ রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন যে প্রজার অন্নে তাঁদের জীবনযাত্রা, সুতরাং বুদ্ধিমত্তা এবং মানবতা দ্বারা চালিত হয়ে তিনি জমিদার হিসেবে অতুল্য সুনাম অর্জন করেছিলেন।[৩]

উত্তরবঙ্গে ঠাকুর পরিবারের তিনটি পরগণা—বিরাহিমপুর পরগণার সদর কাছারি শিলাইদহে, উইসুফশাহী পরগণার সদর কাছারি সাজাদপুর (একে সাজাদ-পুর পরগণাও বলা হয়); কালিগ্রাম পরগণার সদর কাছারি পতিসর। শিলাইদহ পদ্ম-গড়াই তীরে, সাজাদপুর ইছামতী তীরে এবং পতিসর নাগর নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রাম বাংলার অবারিত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং বিচিত্র মানুষের সঙ্গ কবিকে দান করল নতুন জীবন, অভিনব চেতনা। কবি জমিদার হয়ে এসেছেন কিন্তু মানুষ হবার বাসনা তাঁর মনে কি নিদারুণ উদগ্র তা সমকালীন একটি পত্র থেকে অনুধাবন করা যায় :

আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।...অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার ; কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কতলোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর। এই সমস্ত ছেলেপিলে-গরু লাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরল হৃদয় চাষীভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানেনা...আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোষ পরে থাকতে হয়।[৪]

এই অনুভূতি মানুষ রবীন্দ্রনাথের। জমিদার রবীন্দ্রনাথ জমিদারি থেকে অর্থ রোজগার করেছিলেন কিন্তু যাদের কাছ থেকে সে অর্থ আসত, যাদের মাধ্যমে আসত তাদের বাস্তব জীবনকে স্মরণ রেখেছিলেন গভীর মানবিক বিবেচনায়। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছিলেন। তাই জলমহালের দরিদ্র নিকীরীদের তিনি বিনা খাজনায় মাছ ধরবার অনুমতি দেন।[৫] যে অর্থ তিনি প্রজাদের নিকট থেকে খাজনারূপে আদায় করতেন তার মোটা অংশ ব্যয় করতেন তাদের কল্যাণে; দুঃসময়ে তাদের যে খাজনা মওকুফ করেছেন তার পরিমাণ স্মরণযোগ্য। রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় :

It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zamindars. ...Remissions of rent are granted, when inability to pay is proved. In 13\2 it is said that the amount remitted was Rs. 57,595.

জমিদারি পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের পদক্ষেপ ছিল বাস্তবমুখী এবং কল্যাণব্রতী। পতিসর কাছারী-অধীন দরিদ্র অপারগ প্রজাদের তিনি এক বছরেই সাড়ে সাতান্ন হাজারেরও বেশি টাকা মাফ করেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবীর *(মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)* বরাত দিয়ে আনসারুজ্জামান বলেছেন সমগ্র জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথ যে খাজনা মাফ করেছিলেন তার পরিমাণ এক লক্ষ টাকার কম নয়।[৭]

প্রজাদের কল্যাণের জন্য বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের ব্যবস্থা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। দুর্ভিক্ষের সময় বিতরণের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন, মামলা-মোকদ্দমা স্থানীয় -ভাবে মীমাংসার জনমন্ডলী প্রথা প্রবর্তন, শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, জলকষ্ট নিবারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিকল্প আয়ের জন্য তাতের কাজের প্রশিক্ষণ, কৃষি ব্যাংক স্থাপন ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের জমিদারির মহৎ কীর্তি। তাঁকে অনুসরণ করে ভারতের পল্লীপুনর্গঠন, বনায়ন, শিক্ষাসত্র, পঞ্চায়েৎ প্রথা ইত্যাদি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে।

কবি-জমিদার রবীন্দনাথের কল্যাণব্রত ছিল অসাম্প্রদায়িক আদর্শলালিত। তবু পারিপার্শ্বিকতার কারণে ঠাকুর জমিদারিতে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই কম। তবু এটা সত্য যে মুসলমান কর্মচারী ঠাকুর জমিদারিতে একেবারে ছিলনা তা নয়। এই সংখ্যাল্পতার অন্যতম কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান-দের অনগ্রসরতা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে কর্মচারীদের নিয়োগ। মুসলমানদের অর্থনৈ-তিক দুর্গতির অন্যতম কারণ ছিল ইংরেজ সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ।[৮] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসব থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিলেন।

১.১

পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আগমনকালে তদানীন্তন নদীয়া জেলার লোক-সংখ্যার ৫৮% জন ছিল মুসলমান। কুষ্টিয়াতেও তুলনামূলকভাবে মুসলমান সংখ্যা ছিল বেশি। বিরাহিমপুর পরগণা এবং শিলাইদহ অঞ্চলেও বেশিরভাগ লোকই ছিল মুসলমান এবং নিম্নবিত্তের। খোরশেদ শাহ নামক জনৈক আধ্যাত্মিক পুরুষের সুনাম ছিল এ-অঞ্চলে। মুসলমান বাউলদের আনাগোনা এবং তাদের গানের সুর এ-অঞ্চলকে মুখরিত করে রাখত। বাউল-শিরোমণি লালন শাহের প্রভাব রবীন্দ্রজীবনে এবং কাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সাজাদপুর পরগণায় রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রজা ছিল মুসলমান। পতিসরের প্রজাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন ছিল মুসলমান কৃষিজীবী। কবির জমিদারিতে অধিকাংশ প্রজা মুসলমান হলেও মুসলমান কর্মচারী বলতে নিম্নলিখিত মাত্র কয়েকজনের নাম পেয়েছি-নিম্নে তাদের বিষয়ে কিছু তথ্য পরিবেশন করা হলো।

২.০.

শিলাইদহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল খুবই আন্তরিক। বড় ভাইদের সঙ্গে তিনি ১৮৭৬ সালে এবং ১৮৮৮ সালে এ কুঠিবাড়িতে এসেছিলেন নেহাত ভ্রমণের জন্য। ১৮৯০ সালে এসেছিলেন পুণ্যাহ্ উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে। পর বছর জমি-দারির দায়িত্ব নিয়ে আসেন শিলাইদহে। শ্রীশচীন্দ্রনাথ *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে যে কয়েকজন মুসলমান কর্মচারীর নামপরিচয় [১০] বলেছেন তার বাইরে বেশি তথ্য আমরা আপাতত দিতে পারছিনা :

আইনুদ্দিন বিশ্বাস	চরমহালের তহশিলদার
জয়নালউদ্দিন	চরমহালের আমিন
মইনুদ্দিন বিশ্বাস	চরমহালের নায়েব
মেছের সর্দার	বরকন্দাজ-সর্দার

অছিমুদ্দিন	বরকন্দাজ
ছাবের	বরকন্দাজ
উজির	বরকন্দাজ
ফটিক শেখ	শিলাইদহ কুঠিবাড়ির বাবুর্চি।
জামাল	বরকন্দাজ
আবদুল গফুর	(বোটের বাবুর্চি)

এসব কর্মচারীর বিস্তারিত পরিচয় আমরা জানিনা —নানা সূত্রে কবির সঙ্গে এদের কারো কারো যোগাযোগের কিছু বিবরণ মিলছে। নায়েব-তহশিলদার-আমিন— এমন সব গুরুত্বপূর্ণ পদে সেদিনের কোন হিন্দু জমিদারের মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মুসলমান প্রজাদের খাজনায় জমিদারের অন্ন জুটবে অথচ তাদর ভোগে জমিদারি আয়ের কিছু পড়বেনা তা হয়না বলে কবি ভেবেছিলেন। কিন্তু তাদের জন্য কতটা করতে পেরেছিলেন? শিলাইদহের তিনজন পদস্থ (?) কর্মচারী ছাড়া বিশাল জমিদারিতে কয়েকজন বরকন্দাজ, বাবুর্চি আর ভৃত্য ছাড়া বেশি কোন খবর আমাদের জানা নেই।

অছিমুদ্দিন সর্দার : শিলাইদহের অন্তর্গত রাধাকান্তপুরের প্রজা অছিমুদ্দিন ছিল কবি-দলের অধিকারী। কবি একে বেশ প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। সে কবির সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করত। কবি ছিলেন তার ধৈর্যবান শ্রোতা। পদ্মার চরে বোট লাগিয়ে কবি যখন সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন তখনো অছিমুদ্দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত, গল্প করত এবং কবিকে আমলা বাবুদের অনেক খবর দিত। অছিমুদ্দিনের প্রতি বাবু মশায়ের 'ইনসাফ' হয়—তিনি তাকে চরমহালের বরকন্দাজ পদ দান করেন। [১১]

অছিমুদ্দিনের গানে কোন বিশেষত্ব ছিলনা। তার গল্প কবিকে মুগ্ধ করত।

আফাজ উদ্দিন: অছিমুদ্দিনের ভাই আফাজউদ্দিন। সে জারিগানের দল গড়েছিল। মাঝে মাঝে সেও কবিকে গান শোনাত।

মেছের সর্দার : রবীন্দ্রনাথের জমিদারির অন্তর্গত কুমারখালির নিকটবর্তী খয়েরচারা গ্রামের অধিবাসী ঠাকুর জমিদারির প্রজা মেছের সর্দার রবীন্দ্রনাথের জীবনে খানিকটা জায়গা করে নিয়েছিল। মেছের ছিল একজন সাহসী দক্ষ লাঠিয়াল। সেকালে জমিদাররা লাঠিয়াল পুষতেন। তাদের দিয়ে কাজিয়া করাতেন। খুন খারাবি হলে লাঠিয়ালকে জেলে যেতে হত, দ্বীপান্তরও হত।

মেছের বিখ্যাত লাঠিয়াল হলেও সে খুনি হতে পারেনি; সে অনেক লাঠিয়াল-শিষ্য বানিয়েছিল। সাগরেদরা তাকে গুরু বলে ভক্তি করত। শিক্ষা শেষে মেছের তাদের উপদেশ দিত যেন ডাকাতি, খুনখারাবি না করে—সে নামাজ পড়ত এবং নিজ ধর্ম চর্চা করত নিষ্ঠার সঙ্গে।

একদিন কবি–জমিদার খান্টির হাট পরিদর্শন করে বজরায় শিলাইদহ ফিরছেন, কুমারখালির ঘাটে কাতারে কাতারে প্রজারা তাঁকে সেলাম জানাচ্ছে। মেছের সর্দারও তাদের সঙ্গে শামিল হল। যৌবনদীপ্ত রবীন্দ্রনাথের রূপৈশ্বর্য মেছেরকে করলমুগ্ধ, সে মন্ত্র মুগ্ধের মত কবির প্রতি চেয়ে রইল। প্রজারা প্রায়ই চলে গেছে এমন সময় তার হুঁশ হল বাড়ি যেতে হবে। সে সময় তার সাগরেদ, ঠাকুর–জমিদারির বরকন্দাজ, হায়দর সর্দার এসে তাকে সেলাম দিয়ে বাবু মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ইঙ্গিত করল। সে অঞ্চলের হাজার লাঠিয়ালের ওস্তাদ মেছের সর্দারকে দেখে কবি খুশি হলেন। সর্দারের সুঠাম শরীর জামিদারকে মুগ্ধ করল। কবি তাকে বললেন : 'তোমাদের মধ্যে সকলেই কিছু কিছু লাঠি চালাতে জানে। আত্মরক্ষার দরকার হলে হাল ছেড়ে দেয় না। আমি গ্রামে গ্রামে ভদ্রলোকের ছেলেদের লাঠি খেলা শেখাতে চাই। তোমাকে তাদের ওস্তাদ বানাতে চাই। যাবে শিলাইদহে?'[১২] মেছেরকে কবি তাঁর বরকন্দাজ দলের সর্দার নিযুক্ত করলেন। মহানুভব জমিদার যে প্রস্তাব দিলেন মেছের তা শিরোধার্য করে আবেদন করেছিল কবির একান্ত নিরাপত্তা–প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালনের। কবি–জমিদার তাকে সে সুযোগও দিয়েছিলেন। যথা সময়ে মেছের সর্দার লাঠি খেলা শেখাতে আরম্ভ করল—শিক্ষিত যুবক ফনী চৌধুরী, ভবানী আচার্য, অনাদি অধিকারী, সতীশ সরকার তার কাছে তালিম নিতে লাগল। কাছারির মাঠে হায়দর সর্দার, মানিক, আহাদ আলী, কেতু ঢালি এমনি নামজাদা সরদারগণ মেছেরের কাছে লাঠি খেলার তালিম নিতে লাগল। দলে যোগদান করল তমিজ সর্দার, মধুমাল, নাচন সর্দার, বেনী বুনো প্রমুখ-- এসব লাঠিয়ালদের কবি উপযুক্ত মাইনে দিতেন। মেছেরের প্রেরণায় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় লাঠি–সড়কি খেলা কুস্তিশিক্ষায় সেদিন রবীন্দ্র–জমিদারিতে সাড়া পড়ে যায়।

মেছের সর্দার আজীবন ঠাকুর জমিদারির সেবা করেছে, পরিবর্তে বিনা সেলামিতে কুমারখালির চরে পেয়েছিল কিছু জমি দান। প্রশিক্ষণ দান ছাড়াও মেছের খাজনা আদায়ের সময় কর্তব্য করত, কবির সঙ্গে থাকতো, বোট পাহারা দিত। লাঠিয়াল মেছের ছিল ভদ্র, তার ব্যবহার ছিল মিষ্ট। মৃত্যুশয্যায়ও সে তার প্রাণপ্রিয় জমিদার হুজুরের নাম করেছিল। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আহাদ আলী সর্দার তার স্থানে নিযুক্ত হয়েছিল।[১৩]

ফটিক সেখ: ফটিক শেখ ছিল শিলাইদহের বাসিন্দা। সে ছিল বাবু মশায়ের বাবুর্চি। মৃণালিনী দেবী তাকে খুব ভাল রান্না শিখিয়েছিলেন। বাবুর্চিপদ পাবার পর তার পদবী হয়েছিল 'ফরাস'। ভাল বাবুর্চি হলেও ফটিক সেখ ছিল কিছু বদগুণের অধিকারী—ফন্দি করে কিছু উপরি রোজগার করত সে। কবি তা কোনভাবে জেনেও ছিলেন। এবং তাকে বিদায় করবেন বলে ধমকও দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি

জানতেন বিরাট পরিবার ভরণপোষণ করতে গিয়ে ফটিক অমন বদ কাজ করত। তাই দয়ালু জমিদার ফটিককে কিছু জমি দান করেছিলেন এবং আজীবন বহাল রেখেছিলেন চাকুরিতে। তার ছেলে এবং নাতিরাও জমিদারের দয়ায় চাকুরি পেয়েছিল।

আবদুল গফুর: এই সজ্জন লোকটি কবির বোটের সঙ্গে অন্য একটি ছোট নৌকায় রান্নাবাড়ার কাজ করত।

এখানে ঠাকুর জমিদারিতে ১০ জন মুসলমান কর্মচারীর পরিচয় দেওয়া হল। লক্ষ্য করা যাচ্ছে এদের মধ্যে ৩ জন ছাড়া বাকি সবাই অশিক্ষিত। এ-অঞ্চলে শিক্ষিত মুসলমানের হার ছিল শতকরা ১.৬ জন। পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজে শিক্ষিতের হার ছিল ৭.৬%জন।[১৪] ফলে চাকুরির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি হবে স্বাভাবিকভাবেই বেশি।

প্রজারা বাবু মশায়ের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়--তারা তাঁকে সেলাম জানায় নজর দিয়ে। সরল গ্রাম্য ভাষায় তারা সুখ দুঃখের কথা বলে যায়। সহৃদয় শ্রোতা কবি-জমিদারের হৃদয়ে পৌঁছে তাদের সেই নিবেদন। পালকি থামিয়ে একজন মুসলমান প্রজা তাঁকে দুটো টাকা নজর দেয়, নিতে আপত্তি করলে বলে, 'আমরা না দিলে তোরা খাবি কি করে?'[১৫] সরল চাষা ভুষো মানুষের একথা কবির মর্মে গিয়ে বাজে। এদের রোজগারের পয়সা জমিদারের অন্নযোগান দেয়— তথাকথিত শিক্ষিতদের দ্বারা তাদের দায় মেটেনা। একজন শিক্ষিত মুসলমান প্রজা, জনৈক মৌলবি সাহেব, কবির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় মুসলমান ছিলেন না এমন কথা শোনা যায়। মৌলবি সাহেব আরবি পারসি জানতেন। ঠাকুর-জমিদারিতে খাজনা বৃদ্ধির সময় ব্যাপক প্রজা অসন্তোষ দেখা দেয়— সে সময় যারা নানা কারণে খ্যাত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনি একজন। কবিকে তিনি নিশ্চয়তা দেন যে এই অসন্তোষ নিবারণে তিনি যা কিছু প্রয়োজন তা করবেন। কবি বুঝেছিলেন লোকটি নিজ মতলবে জমিদারিতে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। রবীন্দ্রনাথের সামনে ইতিপূর্বে এমন জটিল-চরিত্র প্রজা দেখা দেয়নি।[১৭]

লালন শাহ বাউল-শ্রেষ্ঠ লালন শাহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী স্পষ্ট করে বলেছেন।[১৮] শ্রী অধিকারী লালনকে 'হিন্দুর ছেলে' বলে মন্তব্য করেছেন। পরবর্তী একাধিক গবেষক তাঁকে মুসলমান বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছেউড়ের প্রজাদের সঙ্গে তাঁকে দেখেছিলেন এমন কথাও শচীন্দ্রনাথ অধিকারীই লিখেছেন। লালন বা বাউলদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি রবীন্দ্র-সাহিত্যে বহুভাবে উৎসারিত হয়েছে। জলধর সেন বলেছিলেন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুঠিতে লালন ফকির প্রাতঃকাল থেকে অপরাহ্ন তিনটা পর্যন্ত গান করেছিল। এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন আনোয়ারুল করীম।[১৯] রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতায় সাক্ষাতের ইঙ্গিত অস্বীকার করা যায় না:

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মা নদীর ধারে,
....
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।[২০]

এই 'সাধক' লালন ফকির হতে পারে।
রবীন্দ্রনাথ কলকাতার কৃত্রিম পরিবেশ ছেড়ে পদ্মাতীরের লোকালয়ে এসে যে প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গ লাভ করলেন তাই তাঁর কাব্যে-সাহিত্যে নতুন মহৎ ধারার যোজনা করল। কবির চারপাশে যে অজস্র মানুষ প্রতিদিন তাঁর দৃষ্টিপথে আসতে লাগল তারা তাঁর রচনায় করল আত্মপ্রকাশ। এরা সাধারণ মানুষ, এরা অন্ত্যজ, এরা নানা জাতের। এই সব বাস্তব মানুষ কবির রচনায় হয়ে উঠেছে নায়ক-নায়িকা, বিষয়-উপাদান। কোন বিত্তশালী উচ্চশিক্ষিত মানব-মানবী বাউল হয়নি। অশি-ক্ষিত অল্প-শিক্ষিত নরনারী—শতকরা ৫৮ জন মুসলমান এবং তেমনি নিম্নবিত্ত হিন্দু ঐ অন্ত্যজ শ্রেণীর। তাদের মধ্য থেকে যে লৌকিক সুর উঠেছে, যে মরমিয়া বেদনা জেগেছে তার প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে; শতকরা ৫ জন শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত, উচ্চবর্ণের হিন্দুর[২১] হৃদয়ার্তি *গল্পগুচ্ছ, সোনারতরী, চৈতালি, পুনশ্চ, নবজাতক*-এর একমাত্র সুর হয় ওঠেনি।

৩.০

কবি-জমিদার ১৮৯০ সালে শিলাইদহে পুণ্যাহ্ উৎসবে যোগদানের সময় সাজাদপুর জমিদারিও পরিদর্শন করেন। সাজাদপুর জমিদারিতে তিনি প্রকৃতির অন্য এক রূপ দেখেছিলেন। সেখানকার সরল গ্রাম্য মানুষদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে -ছিলেন, তারাও তাঁকে ভালবেসেছিল। এই কাছারিতে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

রবীন্দ্রনাথ যখন সাজাদপুরে এসেছিলেন তখন পাবনা জেলার গড় জনসংখ্যার ৭৪% জন ছিল মুসলমান। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ছিল নমশূদ্র ৩.৭% শুড়ি ২% কৈবর্ত ১.৯% কুমার ৭% তেলি ৬% চামার ৫% জন।[২২] ব্রাহ্মণ ১.৫% এবং ২.৩% কায়স্থ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সকল শ্রেণীর মানুষেরই কিছু প্রতিনিধিত্ব আছে। *গল্পগুচ্ছে* ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্ম, মুসলমান, কাহার, বণিক, জোলা, কুরি (নমু) প্রভৃতি চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। জমিদার রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ হিসেবেই দেখতেন। তাদের সুখ-দুঃখ সমস্যা-সঙ্কট মানবিক দৃষ্টি দিয়ে তিনি বিবেচনা করতেন। একারণে জমিদার হিসেবে তাঁর সাফল্যও ছিল অভাবনীয়। শিলাইদহ জমিদারিতে প্রজা অসন্তোষের খবর পাওয়া যায় কিন্তু সাজাদপুরে ছিল

নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্ত পরিবেশ। সাজাদপুর জমিদারির আয় ছিল অন্যান্য জমিদারি থেকে বেশি।

সাজাদপুরে কবির অবস্থান স্বল্পকালের—উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে তিনি মোটা-মুটি একটি দশক (১৮৯০-১৯০০) ঘনিষ্ঠভাবে থেকেছেন। তার মধ্যে এখানে পাঁচ বছর আসা-যাওয়া করেছেন। তবে বাইরের যোগসূত্র কম হলেও 'অন্তরের যোগ নিবিড়ভাবেই' কবির স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়েছিল। সে যোগ 'সাহিত্য সাধনার' এবং 'সেবার যোগ'। জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণের আগেও রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর কাছারি পরিদর্শনে একাধিকবার এসেছিলেন। ১৮৯০ সালের সফর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শন। প্রজারা তাঁকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করত তার সঙ্গত কারণ ছিল। সেই হিন্দু প্রাধান্যের যুগে কবি-জমিদার তাঁর মুসলমান প্রজাকুলের সঙ্কটকালে অসাধারণ আন্তরিকতায় তাদের সেবা করেছেন। কবির সেই সাফল্যের মুখে একটি বাস্তব ঘটনার বর্ণনা সম্প্রতি পাওয়া গেছে :

প্রফেসর মযহারুল ইসলাম *দেশ* পত্রিকায় (৫০ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৯ এপ্রিল ১৯৮৩) সেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন 'সাজাদপুরে জমিদার রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাফল্য', প্রবন্ধে। এটি লেখকের নিজ পরিবার-সংশ্লিষ্ট ঘটনা। প্রফেসর ইসলামের পিতামহ আকুল সরকার ছিলেন ঠাকুর জমিদারির (সাজাদপুর) প্রজা। সাজাদপুরের শ্রী বাউল ভদ্রের একমাত্র কন্যা মৃদুললতা এবং আকুল সরকারের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কে বিয়ে হয়। লতা গোপনে আকুল সরকারের ঘরে চলে যান। অতঃপর শ্রী বাউলভদ্র মুড়াপাড়ার প্রতাপশালী ব্যানার্জি জমিদার সমীপে 'অভিযোগ করেন যে, আকুল সরকার জোরপূর্বক তাঁর একমাত্র কন্যা লতাকে নিয়ে গেছে এবং তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেছে।'[২৩] ব্যানার্জি জমিদার এবং সলপের সান্যাল ও গাঁড়াদহের নাগেরা আকুল সরকারকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। ব্যাপারটি সাম্প্রদায়িক রূপ নিতে যাচ্ছিল। যুবক কবি-জমিদার এই সময় সাজাদ-পুর ছিলেন— তিনি এ ঘটনা শুনেছিলেন; হিন্দুকন্যা এবং মুসলমান যুবকের মধ্যকার প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে কবির মনে হয়ত বা কৌতূহল জেগেছিল। তিনি আকুল সরকারকে ডেকে পাঠালেন। আকুল সস্ত্রীক কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কবি যা বুঝলেন তা হল এই যে 'এই বিবাহ বন্ধনের পশ্চাতে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।'' এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ২১ জানুয়ারি ১৮৯০ মঙ্গলবার।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ আকুলকে কোন আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন এবং ব্যানার্জি জমিদারদের সতর্ক করে দেন কোন প্রকার অত্যাচারী ভূমিকা গ্রহণ না করার জন্য। যা হোক, রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে আকুল সরকার এবং মৃদুললতা বিপদ থেকে রক্ষা পান। কবি বিষয়টি তৎকালীন সিরাজগঞ্জের মহকুমা প্রশাস-ককেও জানিয়েছিলেন। তাঁর ধীর-কৌশলী ব্যবস্থায় একটি সাম্প্রদায়িক সংঘাত

এড়ানো যায়। রবীন্দ্রনাথ আকুল সরকারকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা *দেশ* পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি :

প্রিয় আকুল সরকার,

তোমার ব্যাকুলতা আমি উপলব্ধি করেছি। সিরাজগঞ্জ থেকে সাহেব এসেছিলেন, আমি তাঁকে তোমাদের বিষয়টি বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। তুমি নিজের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করোনি এইটে আমার ভাল লেগেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে আমি ঘৃণা করি। মানুষের নিকট মানুষের মর্যাদার বড়ো আর কিছু নেই। নারী পুরুষের প্রেমও এই শাসনই মেনে চলে—সে হৃদয়ের বশ, ধর্মের বা বর্ণের অনুশাসন তার বড়ো নয়। সমাজ প্রাচীর গড়ে কিন্তু হৃদয় অনায়াসেই সে প্রাচীর অতিক্রম করতে পারে। তোমাদের সাথে আলাপ করে আমি তেমনি দুটো হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছি। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শাসনকে নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করবেনা। আশা করি তোমাদের উপরে যে অত্যাচারের আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা দূরীভূত হয়েছে। তোমরা আমার সাহায্য ও সহানুভূতি সর্বদাই লাভ করবে। সুখী হও।

ইতি

সাজাদপুর　　শুভার্থী

২৭ শে জানুয়ারী, ১৮৯০　　রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [২৫]

একজন মুসলমান প্রজার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই প্রীতি সেকালের দৃষ্টিতে অসাধারণ —একালের দৃষ্টিতে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধের মহৎ উদাহরণ। সাজাদপুরে কবির যারা প্রজা তারা প্রায় সবাই মুসলমান। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা নগণ্য।[২৬] কিন্তু কবির কাছে জাত পরিচয়টা মানবসত্যের নিকট কোন অন্তরায় হয়ে দাঁড়া-য়নি। চাষাভূষা দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য তার প্রাণে ছিল অসাধারণ দরদবোধ। সাজাদপুরে রচিত রচনাবলীতে তার পরিচয় মিলবে।

সাধারণভাবে সেকালের জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধি এবং প্রজাপীড়ন ঐতি-হাসিকভাবে সত্য। রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতেও খাজনা আদায় হত কিন্তু তার মধ্যে কোন পীড়নের খবর নেই; আছে খাজনা মওকুফের প্রমাণ। জমিদারের রূপ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা করেও তাঁর প্রজারা খুসি হয়েছিল, এমন একটি ঘটনার উল্লেখ আছে *ছিন্নপত্রে।* রূপচাঁদ মৃধা নামক বৃদ্ধ মুসলমান প্রজা জমিদার রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি··· কতদিন পরে দেখা, এক বৎসর তোমায় দেখিনি।[২৭] সাজাদপুরে সর্বস্তরের মানুষের ভালবাসা পেয়েছিলেন কবি।

দরিদ্র বালক নবদ্বীপ থেকে বয়সী লেখক মোসাররত আলী খান হয়েছিলেন কবির বন্ধু।[২৮] সেই নিভৃত গ্রামে এমন সব বন্ধু না পেলে কবির সেখানে দিন কাটানো হতো অসম্ভব।

সাজাদপুর বা পতিসরের মত মুসলমানপ্রধান গ্রামে বসবাস রবীন্দ্র-জীবনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। জমিদারি তদারক করতে আসবার আগে

মুসলমানদের সম্পর্কে কবির ধারণা এবং আগ্রহ স্পষ্ট এবং প্রগতিশীল ছিলনা। প্রসঙ্গত ১৮৮৪-৮৫ সালের একটি মন্তব্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। রামমোহন রায় প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন :

আমি যদি উদারতাপূর্বক বলি খৃষ্টধর্মে ব্রাহ্মধর্ম আছে, মুসলমান ধর্মে ব্রাহ্মধর্ম আছে, তবে উদারতা নামক পরম শ্রুতিমধুর শব্দটারগুণে তাহা কানে খুব ভাল শুনাইতে পারে কিন্তু কথাটা মিথ্যা কথা হয়। ব্রহ্মাই ভারতবর্ষের জাগ্রত দেবতা জিহোবা, গড্ অথবা আল্লা আমাদের ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন।[২৯]

এই চেতনার পরিবর্তন, বিলম্বে হলেও, ঘটেছিল। সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিবিড় এক একাত্মতার মধ্য দিয়েই তার ভাবনার জগৎ আলোড়িত হয়। সমালোচক স্পষ্ট করেই বলেছেন '১৮৯১ সাল থেকে একটি মুসলমান পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরেই তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে রীতিমতো ভাবতে শুরু করেন।'[৩০] এইসব পল্লী এবং পল্লীর মানুষের সংশ্রব তাঁর সাহিত্য জীবনে আরও একটি মহৎ পরিবর্তনের সুচনা করে। সে হল লোকসাহিত্যের প্রতি তার আগ্রহ। যেদিন তিনি শুনেছিলেন দাঁড়ি মাঝির গান, দেখেছিলেন নৌকায় বধূবিদায় সেদিন তাঁদের জীবনের একান্ত পরিচয়ে কথকতার সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন।

ঠাকুর জমিদারির কর্মচারী আমলা প্রভৃতির নিয়োগ তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের আগেই হয়েছিল। তিনিও অনেক নিয়োগ দিয়েছিলেন। সাজাদপুর জমিদারির মুসলমান কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চপদস্থ কারো পরিচয় আমাদের জানা নেই। বাবুর্চি এনাত আলী, ভৃত্য কোরবান আলী, বাবুর্চি কলিমদ্দী এরা কবির স্নেহ ও সহানুভূতি লাভে ধন্য হয়েছিল। এদের দুঃখবেদনায় বিমূঢ় বেদনার্ত কবি বলেছিলেন 'অন্তরের আমিও এদেরই মত দরিদ্র'।

লালচাঁদ মিয়া: সাজাদপুরের প্রজাকূলের মধ্যে আমরা আকুল সরকারের বিষয়ের উপরে কিছু বলেছি। আর একজন প্রজার বিষয়ে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে (পৃ. ৩২৫-৩৩০) দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে লালচাঁদের সাহসী ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছি। 'সাজাদপুর কাছারির কাছেই একজন মুসলমান প্রজা ছিল, নাম তার লালচাঁদ মিঞা। লোকটি বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু গায়ে বেশ শক্তি ছিল। বৈষয়িক ব্যাপারে ক্ষুরধার বুদ্ধি থাকায় এবং যথেষ্ট জমি-জমার মালিক হওয়ায় সে মামলা মোকদ্দমা খুব ভাল বুঝত। লেখাপড়া জানতনা সে। গ্রামে তার অনুগত জনের অভাব ছিল না, এবং তারা তাকে বলত— 'লালচাঁদ বালেস্টর'।...

'লোকটার পয়সা ছিল বেশ, তাই মামলা-মোকদ্দমা, জোর-জবরদস্তি কোন কাজেই সে পেছপাও হত না; কিন্তু দুর্দান্ত মামলাবাজ চাষী হলেও সে ইচ্ছা করে

পরের অনিষ্ট করত না, তবে নিজের স্বার্থ সাড়ে ষোল আনা বজায় রাখতে সে ত্রিভুবন তোলপার করে ছাড়ত।…

'এহেন ভয়ঙ্কর লাঠি ও মামলাবাজ লালচাঁদ কিন্তু ঠাকুর বাবুদের খুব অনুগত ছিল,—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে সে যে কী চোখে দেখেছিল তা আর কি বলব! তাকে সে দেবতার মত অন্তরের সহিত ভালবাসত, ভক্তি করত।…

লালচাঁদকে ম্যানেজার বাবুও খুব খাতির করতেন, কারণ সে ক্ষমতাশালী প্রজা। এই খাতিরের ফলে বালেস্টর-মিঞা ঠাকুর বাবুদের অধীনে জমিজমাও খুব বাড়িয়ে ফেলেছিল। তার একটা মস্ত দোষ ছিল, সে পার্শ্ববর্তী জমিদার বা জোতদারদের দু'চোখে দেখতে পারতনা; বলত, এমন দু'তিনশো টাকা কালেকটারির খাজনা দিয়ে আমিও জমিদার সাজতে পারি। ঐসব ছুটকো জমিদারেরা তো জমাদার,— আমাদের বাবু মশায়ের কাছারির জমাদার।…

'সেবারে এইরকমভাবে *লেঠেল* নিয়ে পার্শ্ববর্তী জমিদারের চরের জবর দখল করতে গিয়ে সে এক গুরুতর ফৌজদারি মামলায় পড়ে গেল। সে গোপনে রাতারাতি কাজ সারতে গিয়েছিল, কিন্তু তার মতলব টের পেয়ে অপরপক্ষ বাধা দিয়েছিল বেশ প্রবলভাবেই। ফলে অপর পক্ষের দুজন লোককে সে জখম করে। তাইতে তার দলের তিনচার জন *লেঠেল*কে পুলিশে চালান দেয়।….

'লালচাঁদ কিন্তু হাল ছেড়ে দিলনা। সেও আদা জল খেয়ে লেগে গেল।… স্বয়ং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এলেন সদলবলে স্থানীয় তদন্তের জন্যে। লালচাঁদ একটু ভাবিত হয়ে পড়ল।… সাজাদপুর কাছারিতে চিঠি এল, সাহেব ঠাকুর বাবুদের কাছারিতে এসে উঠবেন। সেখান থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে স্থানীয় তদন্তে যাবার জন্য পৃথক অনুরোধপত্র এল।…

'এই খবর পেয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যেও লালচাঁদ খুব আমোদ অনুভব করল… এবারে (বাবু মশায়) দেখবেন, তাঁর পেরজার কলজের জোর কত। বাবুমশাই লালচাঁদকে ডেকে বললেন, এ তুই কি করলি! তুই যে আমার এমন ঝগড়াটে প্রজা তা তো জানতুম না'।'

তারপর তদন্ত কাজে যাবার জন্য লালচাঁদকে দুখানা পালকির ব্যবস্থা করতে বলায় সে তার জমিদারের সম্মানের জন্য একখানা পালকি আর সাহেবের জন্য বেতো ঘোড়া এনেছিল। জমিদারের সম্মান লালচাঁদের কাছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে উচ্চে। এই সম্মানবোধ এবং ভালবাসা এক দুর্লভ ব্যাপার।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী এই গল্পের মধ্যে বলেছেন লালচাঁদ জমিদারকে বলেছে 'বাবু মশায়'— *কিন্তু সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ*-এর লেখক বলেছেন, 'সাজাদপুরে কবি রবীন্দ্রনাথের সাধারণ পরিচয় ছিল 'রাজাবাবু' নামে।[৩১]

সাজাদপুরে অল্পকাল অবস্থানের মধ্যেই কবি সেখানকার জনগণের হৃদয়ে অসাধারণ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদা

নানা প্রকল্প চিন্তা করতেন। সাজাদপুরে মধ্য ইংরেজি স্কুল ঠাকুরদের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এখানে আসবার আগেই— সাজাদপুরের কিরণবালা বালিকা বিদ্যালয়ও তাদেরই অবদান। স্কুল-পালানো রবীন্দ্রনাথ যেখানেই গেছেন শিক্ষার আলোকমশাল জ্বালবার সাধনা করেছেন সেখানেই—নিজ জমিদারির নিভৃত গ্রামগুলোতে সেই সাধনার প্রমাণ আছে। কোন কোন মহল অভিযোগ করেন যে সেকালের হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান প্রধান এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

সাজাদপুরে এসে তরুণ জমিদার-নন্দন স্থানীয় এন্ট্রান্স স্কুল পরিদর্শনের আমন্ত্রণে গিয়ে স্কুলের পরিদর্শন বইতে লিখেন :

Visited the School for the first time, went round all the classes. I do not try to frigten the boys out of their wito by cursory examination wich I find they have often enough. I have every reason to believe that the Headmaster is doiny his duty conscientiously and I dare say the school is as good as any other of its kind. 20.1.90

Rabindranath Tagore

সেদিন রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং অর্থ সাহায্য করেছিলেন তা উত্তরকালে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ঠাকুর বাড়ির আঙিনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের সাজাদপুর সরকারী কলেজ। কবির স্মৃতিকে বুকে ধরে কাজ করেছে কোরবান আলীর পুত্র হাসান আলী। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও সে কুঠিবাড়িতে কর্মরত থেকে জীর্ণ স্মৃতি-উপাদানকে সে অক্ষয় করবার প্রয়াসী হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনী কুঠিবাড়ির দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো ধ্বংস করেছিল কিন্তু ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো হাসান গুছিয়ে রেখেছে।[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ এবং সাজাদপুর বিষয়ে বহু প্রবন্ধ এবং একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে— এইসব রচনায় নতুন তথ্য যে নেই তা নয় তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মতভেদ এবং বিপরীত তথ্যও পাওয়া যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত *শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে উপরে উল্লিখিত লালচাঁদ মিঞা (লালচাঁদ সর্দারী)কে বলা হয়েছে লালু ডাকাত।[৩৪] রবীন্দ্রনাথ ডাকাতকে প্রশ্রয় দিয়ে স্নেহ করেছেন বললে রবীন্দ্রনাথের সুনাম হয়না। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় লাল মিঞা দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ, ম্যাজিস্ট্রেট লোকেন পালিত এমন সব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রবীন্দ্রনাথের এই দুরন্ত প্রজা। কবি একাধিক প্রসঙ্গে 'লালু মিয়ার' প্রশংসা করেছেন। আদর করেই তিনি তাকে 'ডাকাতের সর্দার' বলেছিলেন এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন।

সাজাদপুর কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের মুসলমান বাবুর্চি এনাত আলী সম্পর্কে নরেশ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে বেশ খানিকটা জায়গা দিয়েছেন।[৩৫] তাঁর ভাষায় শাহ-

জাদপুর নিবাসী এনাত আলী ছিল অত্যন্ত ধূর্ত কিন্তু প্রভুভক্ত আবার পরোপকারীও বটে। ......তার রান্নার খ্যাতি ছিল। খুব চমৎকার মোগলাই বানাতে পারতো। তার হাতের রান্না মাংসের চপ, শিক্‌কাবাব, রোস্ট কাটলেটের লোভে অনেক আমলা-বাবুদের সন্ধ্যার পর রসুইখানার আসেপাশে আনাগোনা করতে দেখা যেতো এবং এইভাবে এনাত আলীর দুচার পয়সা রোজগারও হতো। এনাত আলী ছিল অত্যন্ত গরীব। বাড়ীতে আট নয়টি খানেওয়ালা, অথচ সামান্য বেতন, জমিজমাও কিছুই নেই।'...

লেখক বলেছেন, দরিদ্র এনাত আলী ছেঁড়া নোংরা কাপড় চোপড় পড়ত কৌশলে জমিদারের কাছে বস্ত্রাদি আদায় করার জন্য। কবি-জমিদার সত্যি সত্যি এ স্টেটের খরচে তাকে বাবুর্চির পোষাক বানিয়ে দেবার জন্য আদেশ করেন। এর তথ্য হিসেবে লেখক রবীন্দ্রনাথের অর্ডার-বুক থেকে ১৩০৩ সালের ৯ শ্রাবণে প্রদত্ত আদেশের বরাত দিয়েছেন।

সমসাময়িক কালে কর্মরত কবির আর একজন মুসলমান ভৃত্যের পরিচয় এ-বইতে পাওয়া যায়—তার নাম ছিল মমিন মিঞা। সে ছিল 'নির্বোধ। একেবারে ইনকরিজিবল, যাহা না করিবার তাহাই সে করিত।....সব সহ্য করিতাম। জল তোলা প্রভৃতি কাজের জন্য তাহার উপর নির্ভর করিতে হইত।' (রবীন্দ্রনাথ)।[৩৬]

বাবুর্চি এনাত আলীর সহকর্মী ছিল কলিমদ্দি (কলিমুদ্দিন) বাবুর্চি। নরেশ চক্রবর্তী বলেছেন 'কলিমদ্দিকে চিনলেন তো? ঐ যে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' নাটকে যাকে নিযে লেখা হয়েছে—'যাও ঠাকুর চৈতন্য চুটকি নিয়া, এসো দাঁড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।'[৩৭]

প্রজাদের প্রতি জমিদারের পীড়ন বাংলাদেশে হয়ে আছে প্রবাদের মত। রবীন্দ্রনাথও এ-অপবাদ থেকে রেহাই পাননি কিন্তু কবি-জমিদার অন্যসব জমিদার থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র ছিলেন এ-দাবি রবীন্দ্রভক্তরা চিরকালই করে এসেছেন। কিন্তু শাহজাদপুরের বাসিন্দা শাহজাদপুর হাইস্কুলের এককালের শিক্ষক, রবীন্দ্র-স্নেহধন্য নবদ্বীপচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছেন :

> প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথ শাহজাদপুরে এলেন তখন প্রজারা তাদের মনিবের চাঁদপানা মুখ দর্শন করবার জন্য এবং অভাব অভিযোগ জানাতে দলে দলে আসতে লাগলো। রবীন্দ্রনাথ তাদের জানালেন সাদর আহ্বান। কিন্তু তাঁর উদার দৃষ্টির কাছে একটা জিনিষ খুব খাপছাড়া ঠেকলো। অনেক প্রজা এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরবার করে চলে যায়। ফরাস অবশ্য একখানা পাতা আছে, তার উপর ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের প্রজারা শুধু বসবার অধিকার পায়। অথচ অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান প্রজাও দাঁড়িয়ে দরবার করে।

রবীন্দ্রনাথ এ-ব্যবস্থার অবসান কামনা করেছিলেন—শাহজাদপুর কাছারির প্রধান কর্মচারী বিপিনচন্দ্র বিশ্বাসকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'এ তোমাদের কেমনতর

ব্যবস্থা হে। সবাই আমার প্রজা, আমার কাছে সবাই সমান। এই বেনী মণ্ডল, এই আলি নোয়াজ খাঁ। হিন্দু ব্রাহ্মণ এরা ফরাসে বসবেন, আর মুসলমান বা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ভদ্রলোক হলেও, শিক্ষিত হলেও আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে!'

বিপিন বাবু জমিদার রবীন্দ্রনাথকে জানালেন যে, সেই প্রথাই বরাবর চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ চিরাচরিত প্রথার বিরোধিতা করে বললেন :

> আমার বনেদী শিক্ষিত মুসলমান প্রজারা এসে যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে, তখন কি দেখতে খারাপ লাগেনা? ওরা ভাববে কি? ওদের যদি আমরা উপযুক্ত সম্মান না দিই, তবে ওরা আমাদের শ্রদ্ধা করবে কেন? এর পর থেকে সবাই এক ফরাসে বসবে এই ব্যবস্থা কর।[৩৮]

আমলা বিপিন বাবু তার হুজুরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন এ ব্যবস্থায় সুবিধে হবেনা, ব্রাহ্মণরা বসবেনা। রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বলেছিলেন যাদের জাত যাবার ভয় আছে তারা নিজেদের শূচিতা নিয়ে দূরে থাকতে পারেন। অনেক সমালোচনা হলো কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

খানদানি মুসলমান ঘরের ছেলে রবীন্দ্রনাথের প্রজার সন্তান সাজাদপুর হাইস্কুলের ছাত্র আজিজ মিসির পার্শ্ববর্তী ব্যানার্জি জমিদারদের কোপে পড়ে। পুলিশ তাকে ধরতে গেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে আশ্রয় দেন এবং স্কুলের প্রেসিডেন্ট সিরাজগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক মিঃ এফ.ও. বেল–এর অনুমতি ছাড়া তিনি তাঁর কোন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করতে দিবেন না বলে জানিয়ে দিলেন এবং এস.ডি.ও. কে টেলিগ্রাম করলেন। এস. ডি. ও. সাহেব ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলেন। তিনি বিচারকালে তাঁর তাঁবুতে কবি–জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানালেন, রবীন্দ্রনাথ সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন আজিজ মিছির কোনভাবেই দোষী নয়। যে দিন ব্যানার্জিদের নায়েব স্কুলের নিকট ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত হন সেদিন আজিজ মিসির স্কুলে অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং সে বেকসুর খালাস পেল।

আজিজ ছিল নবম শ্রেণীর ছাত্র এবং স্কুল ক্যাপ্টেন। ব্যানার্জি কাছারিতে পূজোর সময় যাত্রা প্যান্ডেল থেকে যে গোলমালের সূত্রপাত হয় তার জের হিসেবে নায়েব ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। শেষ পর্যন্ত তা প্রমাণ করা যায়নি। আজিজ মিছির ছিল ভাল ছাত্র এবং সাহেবের সাথে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলেছিল। তাকে সাহেবের ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথ তার পক্ষে সুপারিশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সুপারিশে এবং বেল সাহেবের সহায়তায় আজিজ পরবর্তী জীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন।

৪.০

১৮৯১ সালের আদমশুমারিতে লক্ষ্য করা যায় যে রজশাহী জেলার গড় জনসংখ্যার শতকরা ৭৯% জন ছিল মুসলমান।[৩৯] এখানে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা ছিলঃ নমশূদ্র ২.১% কোচ ১.২% কৈবর্ত ৩.৮% চামার .৫% কামার .৩% কুমার .৬%

শুড়ি .৫% তেলি .৫%মালো .৩%।[৪০] বর্ণ হিন্দুর সংখ্যা ছিল নগণ্য—ব্রাহ্মণ ১.১% কায়স্থ .৫% বৈদ্য ৩%।[৪১]

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা ছিল দুঃখ জনক। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশি। গড়ে শতকরা ৭ জন হিন্দু ছিল শিক্ষিত তবে উচ্চবর্ণের মধ্যে সে হার ছিল আরো বেশি, যেমন ব্রাহ্মণ ৩০% কায়স্থ ২৮%।[৪২] অর্থনৈতিকভাবেও মুসলমানরা ছিল দুর্গত। তারা প্রায় সকলেই ছিল কৃষিনির্ভর। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তাদের কৌশিকবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। রাজশাহী জেলার অধিকাংশ কৃষিজমি ছিল একফসলা। জমিদারি, মাহাজনী এবং ব্যবসায়িক বৃত্তিতে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যারিষ্ঠ। পতিসরে ঠাকুর জমিদারির অধিকাংশ প্রজাই ছিল কৃষক এবং স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীন। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পেশা আর সব জমিদারের মত হলে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন থাকত না, তিনি ছিলেন কবি এবং সহমর্মী মানুষ। রাশিয়া ভ্রমণের সময় তিনি স্পষ্টতই বলেছিলেন 'নিজেদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যেন আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের 'পরে আর চাপাতে না হয়।' ১৯১৬ সালের রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ারেও স্যাবিন বলেছেন যে ১৩১২ সালে দরিদ্র প্রজাদের রবীন্দ্রনাথ ৫৭,৫৯৫ টাকা খাজনা মাফ করে দিয়েছিলেন।

শিলাইদহে যে মণ্ডলী প্রথা ব্যর্থ হয়েছিল কালিগ্রাম পরগণায় কবি তা বহুলাংশে সফল করেছিলেন। মণ্ডলী গঠনের সময় তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন: 'প্রতি মণ্ডলী মণ্ডলীর নায়েব বাদে চারজন—দুজন হিন্দু, দুজন মুসলমান সভ্য বা কর্মী নিযুক্ত হতেন। কোন মণ্ডলীতে মুসলমান সভ্য থাকতেন একজন। প্রথমে সপ্তাহে দুবার, পরে একবার করে এরা মিলিত হয়ে কাজের ব্যবস্থা করতো। এর ফলে সদর শিলাইদহ কাছারির গুরুত্ব কমে গেল, বিভাগীয় কাছারিগুলিতে অনেক সেরেস্তা গড়ে উঠল; তার ফলে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ল।'[৪৩]

কালিগ্রাম-পতিসর জমিদারিতে অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান প্রজার সংখ্যা বেশি। নতুন অর্থনৈতিক ও পল্লী-পুনর্গঠনমূলক পরিকল্পনায় শিক্ষাবিস্তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাই কবি পরগণায় তিনটি মাইনর স্কুল এবং একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে সেকালেই (১৯১৫-১৬ সালে) আড়াইশ ছাত্র ছিল। স্কুলের খরচ সংকুলানের জন্য কবি বার্ষিক অনুদান ছাড়াও ১৭৫ বিঘা জমি দান করেছিলেন। স্কুলগৃহ এবং ছাত্রাবাস জমিদারি-এস্টেটের অর্থে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

জমিদারি ভাগবাঁটোয়ারার পর পতিসরই হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মহাল। জমিদারি এজমালি থাকাকাল থেকে কবি এখানে অনেকবার এসেছেন। এখানে তাঁর আগমনের সময়গুলো নিম্নরূপ হতে পারে:

১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে শীতকালে কবিকে পতিসর যেতে হয়।[৪৪]

১৮৯২-এর নভেম্বর। ছিন্নপত্র ১১০। দ্র. রজী/১, ১৩৭৭, পৃ.৩৮০।

১৮৯৪-[র-জী ঐ, পৃ. ৩৯১ দ্র.] ফেব্রুয়ারি ১৯ ছিন্নপত্রাবলী ১১৩। আগস্ট ১০দিন, ঐ পৃ. ৪০৬।

১৮৯৫ ১১ চৈত্র-২ বৈশাখ পতিসরে নৌকায় বাস। জুলাই মাসে পুনরায় উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ।

১৮৯৬ পতিসর ও শিলাইদহে ১ মাস ছিলেন—চৈত্র; র-জী ঐ, পৃ.৪৪৪।

১৯০০ আষাঢ় পতিসরে পুণ্যাহ্নতে উপস্থিত ছিলেন। ঐ, পৃ.৪৯৭।

১৯১০ ৩১ শ্রাবণ-১৩ ভাদ্র। ভ্রমণ সঙ্গী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্র. র-জী/ ২,১৩৮৩, পৃ.২৯৬।

১৯১১ পতিসর পরিদর্শন, র-জী/২, ঐ, পৃ. ৩৩৯।

[১৯১৩ কলেরার প্রকোপের সময় কবি উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন] ১৯৩৭-এ শেষ বার পতিসর পরিদর্শন।

পতিসরের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

পতিসরের গ্রাম্য নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল কাটা শস্য ক্ষেত্র ধূ ধূ করছে.... দুঃসহ গরম।[৪৫]

এই রুদ্ধ পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করেন। কালিগ্রাম পরগণায় প্রজা শতকরা আশিজনই মুসলমান বলে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হবে এটা ছিল তার দৃঢ় ধারণা। তিনি বলেছেন 'আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে—হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই।' শিলাইদহে কবির এই অভিজ্ঞতা হয়, কবির মণ্ডলী-প্রথার পরিকল্পনা কালিগ্রাম পরগণায় খানিকটা সফল হয়েছিল। সেদিন দুর্ভিক্ষ, অশিক্ষা, মামলা মোকদ্দমা থেকে প্রজাদের রেহাই দেবার জন্য আপন কল্যাণ চিন্তা কার্যকর করবার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। শক্তিবান বা পরাক্রান্ত জমিদারগণ উৎপীড়নকারী এবং অবদান্য ছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার বিরাট ব্যতিক্রম। (দ্র. *রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ার* ১৯১৬)। পতিসরে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথ মহাজনী কারবার আরম্ভ করেন নি, প্রজাদের মহাজনদের হাত থেকে বাঁচানোই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য: কলকাতার বন্ধুদের নিকট থেকে টাকা কর্জ করে তিনি প্রজাদের ঋণ দিতেন সেজন্য কর্জদানকারীদের ৭% হারে সুদ দিতে হতো। পতিসর ব্যাংক কৃষকদের কাছে দাবি করত ১২% সুদ। সুতরাং লভ্যাংশ ছিল প্রান্তিক। নোবেল পুরস্কারের সমুদয় অর্থই তিনি এই ব্যাংকেই গচ্ছিত রেখেছিলেন এবং প্রজাদের কর্জ দেওয়া হয়েছিল। 'রুরাল ইনডেটেডনেস্ আইন' পাশের পর প্রজাদের নিকট থেকে সে অর্থ আর ফিরে আসেনি।

অনুপস্থিত বা শহরবাসী জমিদারকে নায়েব গোমস্তারা প্রজাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করতো কিন্তু ঠাকুর জমিদারির (কালিগ্রাম পরগণা) সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য হলো: **Enployees ares expected to deal fairly arth the raiyats and unpopularity ear dismisal.** (পূর্বোক্ত গেজেটিয়ার দ্র.)। এমন কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে জমিদারির অর্থে প্রজাদের কল্যাণের জন্য তাঁর পদক্ষেপ যেমন—জমিদারির প্রতি বিভাগে একটি করে নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তিনটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, পতিসরে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা, অন্ধ এবং খঞ্জদের জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুর তার শুভ ইচ্ছার প্রতীক। নিজ পুত্রকে বিদেশ থেকে কৃষি বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে এনে গণ্ডগ্রাম পতিসরে তাকে চাষীদের কৃষিকর্মে সহযোগিতার উপদেশ দেন।[৪৬] কালের দৃষ্টিতে এসব প্রয়াস অবশ্য ব্যতিক্রমধর্মী।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে শিলাইদহের চারপাশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না বলে সেখানে নতুন কিছু প্রবর্তন করা যায়নি। সে কারণে কবি কালিগ্রাম পরগণায় বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। গ্রাম সংস্কারের জন্য 'হিতৈষী সভা' প্রতিষ্ঠা করে কবি গ্রামের শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষ্টির উন্নিত করে, দুর্ভিক্ষরোধে ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠাকরে, রাস্তাঘাট মেরামত করে, জলাধার নির্মাণ করে সকল প্রজার কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। সালিসীর মাধ্যমে বিচার করে কোর্ট কাছারি যাবার ঝকমারি থেকে তিনি প্রজাদের বাঁচিয়েছিলেন। পতিসরে কৃষির উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকে ট্রাকটর নিয়েও চাষ করেছিলেন কিন্তু 'দেশটা নিতান্তই এক ফসলা' বলে বিশেষ উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। বর্ষার ক'মাস জলমগ্ন থাকার পর শুষ্ক মৌসুমে মাটি এত নীরস হয় যে লাঙল চলেনা, রবিশস্য হয়না।

কবি পুত্র বলেছেন : 'বাবা আমাকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন কয়েকটি কুটিরশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা করতে। কালীগ্রামে ভালো তাঁতি ছিলনা, মুসলানদের মধ্যে কয়েক ঘর জোলা ছিল...তাদের একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হলো তাঁতে কাপড় বোনা বাড়ানো শেখাবার জন্য।...শিখে ফিরে এল, সাধারণ ফন্ডের খরচে তাকে শিক্ষক করে একটি বয়স্ক শিক্ষার স্কুল খোলা হলো।'[৪৭] বিকল্প আয়ের সংস্থানের উদ্দেশ্যে পতিসরে কুটিরশিল্প গড়ে তোলার জন্য কবিপুত্র প্রজাদের উৎসাহিত করতেন। কবির আদেশ-মত এনড্রুজ এবং পিয়ার্সনও প্রজাদের দুঃখ মোচনের জন্য পতিসর এসেছিলেন।

১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মত পতিসর জমিদারি পরিদর্শন করেন। কালিগ্রামের প্রজাদের নিকট থেকে পুণ্যাহ্তে যাবার আমন্ত্রণ এসেছিল। সেবারে সহযাত্রী ছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এবং প্রাক্তন ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। রাজশাহীর তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রখ্যাত সাহিত্যিক

এম দাশ ধর রায়ও কবির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আত্রাই স্টেশনে নেমে বোটে করে তাঁরা পতিসর রওয়ানা হয়েছিলেন। সেবার অনাবৃষ্টিতে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পুড়ে গেছে। মুসলমান-প্রধান এলাকা — মাঝিমাল্লারা বলাবলি করছিল বাবুমশাই জমিমারিতে পা দিচ্ছেন, আল্লাহ্‌র দোয়ায় 'দেওয়া' হবে। সত্যিসত্যি কাছারির মাইল খানেক দূরে থাকতেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছিল।

সবাই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, কী আশ্চর্য, বাবুমশাই জমিদারিতে পা দিতেই কী সুন্দর বর্ষণ, খোদাতালার আশীর্বাদ নেমে এল, চাষিরা এবার বাঁচল,— এ দেশটা রক্ষা পেল।... সবাই মহানন্দে কলরব করতে লাগল।[৪৮]

পরদিন কাছারি প্রাঙ্গণে কবির সংবর্ধনা—বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে কবি এলেন। একজন মুসলমান প্রজা কবি-জমিদারকে অভ্যর্থনা জানালেন অভিনন্দন-বাণী পাঠের মাধ্যমেঃ

মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার
শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের
পরগণায় শুভাগমন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি—

প্রভো, প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি
দেবরূপে এসে দিলে দেখা।
দেবতার দান অক্ষয় হউক,
হৃদিপটে থাক স্মৃতিরেখা।।
তোমার করুণাকাঙক্ষী

পতিসর সদর কাছারি কালীগ্রাম পরগণায় রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের পক্ষে
(রাজশাহী) মোঃ কফিলদ্দিন আকন্দ বয়তোয়াল।[৪৯]
১২ই শ্রাবণ ১৩৪৪

আত্রাই স্টেশন কলকাতাগামীট্রেন। এই পরিদর্শনের পর বিদায়ের পালা। সে ছিল বিচ্ছেদ বিধুর এক র্মমান্তিক দৃশ্য। অন্নদাশঙ্কর তার প্রত্যক্ষদর্শী—তিনি লিখেছেন:

'ওরা কি বলছে শুনবে?' রবীন্দ্রনাথ বলতে থাকলেন, 'বলছে, পয়গম্বরকে তো স্বচক্ষে দেখিনি, আপনাকে দেখেছি।[৫০]

ইয়া ইয়া দাড়িওয়ালা মুসলমান তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল শিষ্যজনের মতো।...শেষবারের মতো তাকে তাঁরা সালাম করল।[৫১]

প্রজাদের উদ্দেশ্যে কবির শেষ ভাষণ ছিল 'আমি তোদের বড় ভালবাসি'। তোদের দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়। কিন্তু বোধ হয় এ পরগণায় আমার শেষ আসা। আর যে তোদের কাছে আসতে পারবো সে আশা করতে পারিনা। তোদের কাছে অনেক কিছু পেয়েছি, কিন্তু তোদের কিছুই দিতে পারিনি। আশীর্বাদ করি তোরা সুখী হ বলার অনেক কিছুই ছিল কিন্তু আর বলা হল না।'[৫২]

পতিসর রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজ অংশের জমিদারি হলেও এখানে শিলাইদহের মত মুসলমান কর্মচারী ছিল তেমন কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। কবেজ আলী (পতিসর) নামক এক মুসলমান পাচক এবং ফটিক নামক এক ভৃত্যের নাম শুনেছি। বাবুর্চির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল (১৯৭২)। পতিসরের প্রজামণ্ডলে শতকরা ৮০% ছিল মুসলমান।[৫৩]

৫.০

জমিদার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক আজো অনিঃশেষ– 'মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টির রবীন্দ্র-বিতর্ক, যুগপৎ চলছে। তবে তথ্যের চে. 'ইঙ্গিত' এ বিতর্কে বেশি মাত্রায় পল্লবিত হয়েছে। কাঙ্গাল হরিনাথ *গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়* 'ঠাকুর জমিদারির প্রজাপীড়নের সংবাদ' কবে কোন সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন তা প্রামাণিকভাবে আজো জানা যায়নি। *সাহিত্য* (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত) পত্রিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত কাঙ্গাল হরিনাথ সম্পর্কিত প্রবন্ধে ঠাকুর জমিদারির প্রজাপীড়নের 'সংবাদ-সূত্র' লক্ষ্য করে 'রুষ্ট অপ্রসন্ন' রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার মৈত্রের *রানীভবানী* গ্রন্থ প্রকাশে 'মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিশ্রুত অর্থ প্রত্যাহার করান'[৫৪] এসব বক্ত-ব্যের অনুকূলে মুক্তদৃষ্টির সমালোচকগণ প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থিত করলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি নতুন সংযোজন হবে। এই প্রসঙ্গে "বিশ শতকের বিশের দশকে প্রজাপীড়ক শোষক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শিলাইদহের ইসমাইল মোল্লার নেতৃত্বে দু'শঘর প্রজার বিদ্রোহ'[৫৫] পূর্ণাঙ্গভাবে লিখিত হলে রবীন্দ্রজীবনের এক অনুদঘাটিত ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারবে[৫৬] এবং বাঙালির আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে তা হবে একটি মূল্যবান অধ্যায়। সমস্যাপূরণ, শাস্তি, উলুখড়ের বিপদ, হালদারগোষ্ঠী ইত্যাদি গল্পে জমিদার হয়েও জমিদার চরিত্র যেভাবে তিনি অঙ্কন করেছেন তা ইতিহাস-অনুকূল— নিজকে আড়াল করবার কোন প্রয়াস এতে আছে বলে মনে হয় না।

তথ্যনির্দেশ

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী, প্রথম সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ১৯৬২, পৃ. ৩১

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী,* প্রথম খণ্ড, বি-ভা, চ. স. ১৩৭৭, পৃ. ৩০৩-৪

৩ তদেব পৃ. ৩০৪

৪ *ছিন্নপত্রাবলী,* পত্র ১৫, সাজাদপুর, রবিবার ২০ মাঘ ১২৯৭, ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি,

৫ আনসারুজ্জামান, *সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ,* বর্ণমিছিল, ঢাকা, প্র. স.১৯৭৪, পৃ.২১

৬ Extract from 'Bengal District gazetters, Rajshahi'by Mr. L. S. S. O' malley, 19\6.

৭ পূর্বোক্ত, *সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ,* পৃ. ১৯।

পতিসর রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজ অংশের জমিদারি হলেও এখানে শিলাইদহের মত মুসলমান কর্মচারী ছিল তেমন কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। কবেজ আলী (পতিসর) নামক এক মুসলমান পাচক এবং ফটিক নামক এক ভৃত্যের নাম শুনেছি। বাবুর্চির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল (১৯৭২)। পতিসরের প্রজামন্ডলে শতকরা ৮০% ছিল মুসলমান।[৫৩]

৫.০

জমিদার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক আজো অনিঃশেষ– 'মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টির রবীন্দ্র-বিতর্ক, যুগপৎ চলছে। তবে তথ্যের চে' 'ইঙ্গিত' এ বিতর্কে বেশি মাত্রায় পল্লবিত হয়েছে। কাঙ্গাল হরিনাথ *গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়* 'ঠাকুর জমিদারির প্রজাপীড়নের সংবাদ' কবে কোন সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন তা প্রামাণিকভাবে আজো জানা যায়নি। *সাহিত্য* (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত) পত্রিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত কাঙ্গাল হরিনাথ সম্পর্কিত প্রবন্ধে ঠাকুর জমিদারির প্রজাপীড়নের 'সংবাদ-সূত্র' লক্ষ্য করে 'রুষ্ট অপ্রসন্ন' রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার মৈত্রের *রানীভবানী* গ্রন্থ প্রকাশে 'মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিশ্রুত অর্থ প্রত্যাহার করান'[৫৪] এসব বক্ত-ব্যের অনুকূলে মুক্তদৃষ্টির সমালোচকগণ প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থিত করলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি নতুন সংযোজন হবে। এই প্রসঙ্গে ''বিশ শতকের বিশের দশকে প্রজাপীড়ক শোষক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শিলাইদহের ইসমাইল মোল্লার নেতৃত্বে দু'শঘর প্রজার বিদ্রোহ'[৫৫] পূর্ণাঙ্গভাবে লিখিত হলে রবীন্দ্রজীবনের এক অনুদঘাটিত ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারবে[৫৬] এবং বাঙালির আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে তা হবে একটি মূল্যবান অধ্যায়। সমস্যাপূরণ, শাস্তি, উলুখড়ের বিপদ, হালদারগোষ্ঠী ইত্যাদি গল্পে জমিদার হয়েও জমিদার চরিত্র যেভাবে তিনি অঙ্কন করেছেন তা ইতিহাস-অনুকূল— নিজকে আড়াল করবার কোন প্রয়াস এতে আছে বলে মনে হয় না।

তথ্যনির্দেশ

১　প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী, প্রথম সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ১৯৬২, পৃ. ৩১

২　প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী,* প্রথম খন্ড, বি-ভা, চ. স. ১৩৭৭, পৃ. ৩০৩-৪

৩　তদেব পৃ. ৩০৪

৪　*ছিন্নপত্রাবলী,* পত্র ১৫, সাজাদপুর, রবিবার ২০ মাঘ ১২৯৭, ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি,

৫　আনসারুজ্জামান, *সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ,* বর্ণমিছিল, ঢাকা, প্র. স.১৯৭৪, পৃ.২১

৬　**Extract from 'Bengal District gazetters, Rajshahi'by Mr. L. S. S. O' malley, 19\6.**

৭　পূর্বোক্ত, *সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ,* পৃ. ১৯।

৩৩ তদেব পৃ. ১৩
৩৪ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, *শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ কলকাতা ১৯০০ পৃ. ৩০–৩১
৩৫ তদেব পৃ. ৩৫
৩৬ তদেব পৃ. ৩৫ দ্র.
৩৭ তদেব পৃ. ৭
৩৮ পূর্বোক্ত, *শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ৫২
৩৯ *Report on the census of India*, 1891, vol. iv. P. 36.
৪০ তদেব পৃ. ৪৩
৪১ তদেব পৃ. ৪৩
৪২ তদেব পৃ. ৩২৩
৪৩ পূর্বোক্ত, *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ* (শচীন্দ্রনাথ অধিকারী) পৃ. ৪২১
৪৪ *রবীন্দ্রজীবনী* (প্রভাতকুমার) ১ম খন্ড, ১৩৭৭, পৃ. ৩০৪।
৪৫ রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, *চৈতালি*, ২০ জুলাই ১৯৪০, *রবীন্দ্র -রচনাবলী*, ৫ম খন্ড বি–ভা ১৩৮১
৪৬ রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি*, কলকাতা ১৩৭৮, পৃ. ২৪৩।
৪৭ তদেব পৃ. ২৪৬
৪৮ পূর্বোক্ত *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ২১৫
৪৯ তদেব পৃ. ২১৯।
৫০ একালের শওকত ওসমান এমনি ধারা কথা বলেছিলেন ঃ
'তাঁর নবতিমূল্য দৃষ্টি অনেকান্ত বিস্ময়কর ধারায় প্রবাহিত।'
আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, *রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা ১৩৭৫, পৃ. ৯৯
৫১ অন্নদাশঙ্কর রায়, রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১–২১
৫২ শাহ আলম চৌধুরী, পতিসরে রবীন্দ্রনাথ, *দৈনিক বার্তা* ১৬.৭.৭৮; লেখক এটি নকল করেছিলেন বিজলী প্রভা সাহা নামক পতিসরের এক বৃদ্ধার নিকট সংরক্ষিত (তাঁর স্বামী মনীন্দ্র চন্দ্র দাস কর্তৃক অনুলিখিত) জীর্ণ কাগজপত্র থেকে।
৫৩ মুসলমানদের 'কোন ব্যক্তিগত কৃতি কিংবা গুণমান মাহাত্ম্য তাঁর কাব্য প্রেরণার উৎস হয়নি। এমন কি আকবর বাদশাহ্ কিংবা মঈনউদ্দিন চিশ্তি, রাজিয়া, আনার কলি–নূরজাহানও নন……… এতে মনে হয় বিদেশাগত এ শাসক গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অন্তরের গভীরে প্রচন্ড ঘৃণা বিদ্বেষ বা স্থায়ী অশ্রদ্ধা ছিল– অথচ শাসক ইংরেজের প্রতি তাঁর এ বিদ্বেষ দেখা যায় না, বরং বড় ইংরেজের প্রতি ছিল তাঁর নিবিড় অনুরাগ·······' আহমদ শরীফ, রবীন্দ্রত্তোর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন (প্রবন্ধ) মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টির বীন্দ্র বিতর্ক, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২১।
৫৪ চরের মুসলমান প্রজাদের টিট করবার জন্যে নমশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিও রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। এ ছাড়া পুত্র রথীন্দ্রনাথের নিরীক্ষামূলক শখের কৃষি–খামারের প্রয়োজনে গরীব, মুসলমান

চাষীর ভিটেমাটি দখল করে তার পরিবর্তে তাকে চরের জমি বরাদ্দের মহানুভবতাও রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শন করেছিলেন। এ সব কথা উক্ত জীবনীকারদের যত্ন ও সৌজন্যে চাপা পড়ে গেছে।–আবুল আহসান চৌধুরী, শ্রদ্ধাভাজনেষু, পাদটীকা, পূর্বোক্ত *মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টির রবীন্দ্র-বিতর্ক*, পৃ. ২৮২৯

৫৫ আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৫৬ অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, *শারদীয় দেশ*, ১৩৮২